ইউনিট ৫ বাংলাদেশে শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মূলভিত্তি এবং এ ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষা জীবন। এ স্তরে শিক্ষা যথার্থরূপে এবং সুষ্ঠুরূপে দেয়ার উপরই পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখার উন্নতিকল্পে আমরা যত অর্থই ব্যয় এবং যত শ্রমই দেই না কেন সবই বিফলে যাবে যদি না প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব হয়। কেননা, এ স্তরের শিক্ষার্থীরা এ সময়ে যা কিছু জানবে ও শিখবে তাই তাদের সমগ্র জীবনভর প্রভাবিত করবে। এ স্তরের শিশুদের এ সময় সকল বস্তু সম্পর্কে ধারনা বিমূর্ত থাকে এবং সংখ্যা, সময় ও পরিমান সম্পর্কেও তাদের ধারনা হয় অস্পষ্ট ও একমাত্রিক। অধিকন্তু, খেলা ও অনুকরণের মাধ্যমে শিশুর ভাল লাগাও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রয়াস পায়। প্রাথমিক শিক্ষার যতই প্রসার ঘটবে, ততই জাতি নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। পৃথিবীর সব দেশে তাই সমভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আলোপ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়।

এ ইউনিট পাঠে বাংলাদেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ৫.১ প্রাথমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের গুরত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারনা লাভে সক্ষম হবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও এর বাস্তব প্রতিফলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

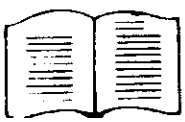

শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয় পশ্চাদপদতাই আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার পেছনে প্রধান ও মৌলিক কারণ। সুতরাং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির যে আশা আকাঙ্খার কথা বলা হয়ে থাকে যথার্থই তা বাস্তবায়িত করতে হলে সর্বাগ্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি। প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং এ ভিত্তির উপরই গড়ে উঠে পরবর্তী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষা জীবন। প্রাথমিক শিক্ষা যথার্থভাবে দেয়ার উপরই পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রাথমিক শিক্ষা উত্তমরূপে দেয়া হলে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ যদি নাও মেলে তাহলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্বল করেই জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা যায় এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় অবদানও রাখা চলে।

শিক্ষাকে সাধারণভাবে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য স্তরের শিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই এ কথাটি বেশি করে প্রযোজ্য। তাই দেখা যায় যে, আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রায় সব দেশে করা হয়েছে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। তাই শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের শাস্তি পেতে হয়। এ ধরনের সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবী সকল দেশের মানুষের। জাতিসংঘ স্বীকৃত এ একটি মৌলিক অধিকারও বটে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার দাবী পাকিস্তান আমল থেকেই উঠেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা এ দেশে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক কোনোটাই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নাই। আর মূলতঃ এটাই আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষিতের সংখ্যার নিম্ন হারের প্রধানতম কারণ। নিরক্ষরতা দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে একটা মৌলিক বাধা হয়ে আছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যে বিন্যাসে প্রাথমিক শিক্ষার থাকবে মৌলিক এবং সর্বাধিক গুরুত্ব। সংখ্যা এবং গুণগত উভয় দিক থেকেই

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকতে হবে। ক্রমে এ শিক্ষাকে করে তুলতে হবে সার্বজনীন ও যথার্থ ও অর্থে বাধ্যতামূলক। একমাত্র তাহলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতার লজ্জা ঘুচতে পারে। অগ্রগতির পথে আমাদের পদক্ষেপ হতে পারে নিশ্চিত।

প্রাথমিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক। সুতরাং প্রাথমিক স্তরে শিশুকে শিক্ষার জন্য শিশুর দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুর বয়স ৬+ থেকে ১০+ পর্যন্ত থাকে। বয়সভেদে শিশুর চাহিদার তারতম্য দেখা যায়। এ চাহিদা সুষ্ঠু পরিপূর্ণ শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ বিকাশ নানাবিধ হতে পারে। যেমন– শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি-ভিত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয়। শিশুর এ চাহিদা আচরণের সৃষ্টি করে, এ আচরণকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে শিক্ষার পথ সুগম হবে এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও সার্থক হবে। তাই শিশুদের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। শিশু গৃহ পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠে, এবং এ তিনটি অবস্থাতেই শিশুরা অনুকূল পরিবেশ চায়। কাজেই গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ শিশুর বিকাশের জন্য উত্তম ক্ষেত্র। সমাজ এবং রাষ্ট্র আশা করে শিশুর অন্তর্নিহিত ব্যক্তি সত্তার সুষ্ঠ বিকাশের মাধ্যমে সে একজন স্বাবলম্বী, সুদক্ষ ও যোগ্য নাগরিকরূপে প্রতিভাত হবে, এবং জ্ঞানে বিজ্ঞানে সংগঠনে, কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তাই আমাদের দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি এ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা যায় তবেই আমাদের শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন সম্ভব হবে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করবে।

শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রণয়ন কমিটি নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করেছেন–

১। মাতৃভাষা
২। গণিত
৩। পরিবেশ পরিচিতি
৪। ধর্ম-শিক্ষা
৫। শারীরিক শিক্ষা
৬। চারু ও কারুকলা
৭। সংগীত
৮। ইংরেজী।

উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয় পাঠদানের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলো পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু কেবল তত্ত্বগত জ্ঞানই লাভ করবে না বরং কর্মমুখী শিক্ষা, শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধও জাগরিত হবে। শিশুর আকাংখিত বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রমে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু প্রয়োগ করা হয় তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। সুশিক্ষার জন্য পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার পরিবেশ; কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার পরিবশে সর্বত্রই বিঘ্নিত। অন্ততঃ বিদ্যালয়ে এবং সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে গৃহে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগে গ্রহণ করা শিক্ষকেরই দায়িত্ব। শিক্ষকগণ পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে কতটুকু সক্রিয় এবং সচেতন তা ভেবে দেখা দরকার।

শিক্ষাক্রমের পূর্ণাংগ প্রতিফলনের জন্য বিদ্যালয়ের দৈনিক কর্মসূচীতে প্রতিটি বিষয়ের ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনীয় সময় বন্টন করা এবং পাঠদানের মাধ্যমে তার উৎকর্ষ সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু সাময়িক ও বাৎসরিক মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষাদানের প্রয়োগশীলতা যাচাই করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুচিন্তিত দৈনিক কর্মসূচীর ব্যবস্থা অনুপস্থিত। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের দৈনিক কর্মসূচী বিদ্যমান থাকলেও তা' পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং ধর্ম শিক্ষা, শারীরিক

শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সংগীত প্রভৃতি বিষয়গুলো দারুনভাবে অবহেলিত। শিক্ষাক্রমের প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যই কতর্ব্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত বিরল। আবার শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য পাঠদানের সহায়ক সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার অপরিহার্য হলেও বিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত অনুপস্থিত। ১৯৮৩ সালে ৪৪,০২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৬,৬৮৫টি সরকারী ছিল এবং সামগ্রিক প্রাথমিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৪.৫ লাখ, তন্মধ্যে ৫০.৫ লাখ ছেলে, মেয়ে ৩৪.৫ লাখ, এবং শিক্ষক ১৮৮.২৮৪ তন্মধ্যে ১৫৭.০৩২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় ২১০.১৮ কোটি টাকা (১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে) এবং প্রতি দু'হাজার লোকের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতির মধ্যে কোনো রূপ উন্নতি হয়নি। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়েনি। শুধু তাই নয় দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে বেশী। প্রাথমিক শিক্ষার মাঝ পথে বিদ্যালয় ত্যাগ ভয়াবহ হারে আগেও ছিল এখনও আছে। সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যে যে স্থবিরতা বিরাজ করছে পরিকল্পনা কমিশনের সমীক্ষায় তা স্বীকার করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কোনো সুপারিশ রাখা হয়নি, যেহেতু ইতিমধ্যে যতগুলো বিদ্যালয় চালু হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি কাজে লাগছে না। তাই প্রাথমিক শিক্ষা যাতে ফলপ্রসু ও উৎপাদনমূখী, বাস্তব করে তোলা যায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণীত হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয়।

পাঠোত্তর স্ব-মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে–
- (ক) অবৈতনিক
- (খ) সার্বজনীন
- (গ) বাধ্যতামূলক
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সত্য নয়

২। শিশুর বিকাশ হতে পারে–
- (ক) মানসিক
- (খ) নৈতিক
- (গ) সামাজিক
- (ঘ) উপরের সব কয়টিই সত্য

৩। শিশুর চাহিদা সৃষ্টি করে–
- (ক) আচরণের
- (খ) বুদ্ধিবৃত্তির
- (গ) অনুসন্ধিৎসার
- (ঘ) আবিষ্কারের

৪। **শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজন–**
- (ক) **গৃহ পরিবেশ**
- (খ) **বিদ্যালয় পরিবেশ**
- (গ) **সমাজ পরিবেশ**
- (ঘ) উপরের সব কয়টিই সত্য

৫। ১, প্রাথমিক স্তরের পঠিতব্য বিষয়ের সংখ্যা হলো–
- (ক) ১০টি
- (খ) ৮টি
- (গ) ৭টি
- (ঘ) ৬টি

পাঠ ৫.২ মাধ্যমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও এর বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রতিফলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

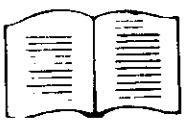

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সমগ্র শিক্ষা কাঠামোতে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, সেহেতু সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। তবে এ শিক্ষাক্রম যেন পুঁথিসর্বস্ব না হয়ে বাস্তবমূখী হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। ১১ থেকে ১৭ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রত্যেকের জীবনে এ সময়টুকু অত্যন্ত মূল্যবান। তাই এ স্তরকে ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের স্তর বলা হয়ে থাকে। কাজেই এ স্তর শিক্ষার দিক থেকে নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক স্তর বলতে এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা মানব জীবনের একটা আবেগময় এবং গঠনমূলক অংশ। এ সময় শিক্ষার্থী বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছে, তাই সহজেই তারা প্রভাবিত হয়। এ সময় যদি শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনাযায়ী শিক্ষা দেয়া না হয় তবে তারা সহজেই অন্ধকারময় হয়ে উঠে। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগীতামূলক মনোভাব, বিচার শক্তির উন্মেষ, কাল্পনিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক জীবনে তার এক নতুন পরিবর্তন ধরা পড়ে না। এ সময় দ্রুত দৈহিক বিকাশ লাভের ফলে মানসিক আবেগ জনিত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের উপর নির্দেশনা প্রয়োজন যাতে করে তাঁরা পরবর্তীকালে সুষ্ঠু জীবন যাপনের প্রস্তুতিমূলক নানা কলা-কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। কাজেই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিষয়সমূহ এর বিধান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখা যায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর।

আর মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে শিক্ষা জীবনের পূর্ণাঙ্গ আকাশ পথ। মাধ্যমিক স্তর পার হওয়ার পর শিক্ষার্থী নিজের ইস্পিত বিষয় বেছে নিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। কোনো শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হলে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত শিক্ষা চর্চার অভাবে নিরক্ষরতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং, মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার কোন মূল্য নেই। দেশ গঠনের সকল ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা, সম্পদ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তকর্মী সৃষ্টি হওয়ার কথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে। মাধ্যমিক স্তরের পরে শিক্ষার পরিধি অতিমাত্রায় সংকুচিত হয়ে আসে। অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীই যেতে পারে উচ্চ শিক্ষায়। কাজেই, মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতা ও গুণগত উৎকর্ষের উপরই মূলত নির্ভর করে দেশের সব গঠনমূলক উন্নয়নের প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই প্রতিভাবান ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়। তাঁদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নানা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য তাঁদের তৈরি করে। এ পর্যায়েই স্থির হয় ভবিষ্যতে কে হবে চিত্রকর, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, চিকিৎসাবিদ, অধ্যাপক বা অন্য কিছু।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক স্তরের রিপোর্ট নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যবলী বর্ণিত হয়েছে–

১ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

২ সু-সমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবন যাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা।

৩। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশল জন-শক্তি সরবরাহ করা।

৪। মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়ার সংগে সংগে শিক্ষাক্রম ও সংস্কার এবং পাঠ্যসূচি পূর্ণবিন্যাস করা অপরিহার্য। নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য শিক্ষাক্রমে আটটি আবশ্যিক বিষয়, একটি নৈর্বাচনিক ও ব্যবহারিক কাজ রয়েছে। আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে (১) বাংলা (২) ইংরেজী (৩) গণিত (৪) কর্মঅভিজ্ঞতা (৫) ইতিহাস (৬) ভূগোল (৭) পৌরনীতি ও বাণিজ্য (৮) বিজ্ঞান। নৈর্ব্যচনিক বিষয়গুলোর মধ্যে যে একটি- (১) ইসলামিয়াত (২) হিন্দু-ধর্ম (৩) বৌদ্ধ-ধর্ম (৪) খৃষ্টার্ন-ধর্ম (৫) আরবী (৬) ফারসী (৭) উর্দু (৮) সংস্কৃত (৯) পালি (১০) সংগীত (১১) চারু ও কারুকলা (১২) শারীরিক শিক্ষা (১৩) উচ্চতর গণিত ও (১৪) গার্হস্থ্য-অর্থনীতি।

এছাড়া উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় পাঠ্যদানের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিরুপিত হয়েছে। এ বিষয়গুলোর পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধু যে তত্ত্বগত জ্ঞানই লাভ করবে তা নয় বরং কর্মমুখী ও কর্ম অভিজ্ঞতা শিক্ষার মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধ সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মূল্যবোধ, ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, শৃংখলা শিষ্টাচার প্রভৃতি মানবিক আচরনের প্রতিফলন থাকবে। যেহেতু ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্র ভিন্ন সেহেতু মেয়েদের জন্য শিক্ষাক্রমে ভিন্ন বিষয় থাকা প্রয়োজন যদিও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নামে একটি বিষয় আছে।

শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন জন্য বিদ্যালয়ে দৈনিক কর্মসূচিতে প্রতিটি বিষয়ে ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনীয় সময় বন্টন করা এবং পাঠদানের মাধ্যমে তার উৎকর্ষ সাধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাসূচি যে অনাবশ্যক তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত, বাস্তব জীবনের সংগে ক্ষীণ সম্পর্ক, অনেকটা প্রয়োগ মূল্যহীন, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এ শিক্ষা এক মেকী ভদ্রতা আর পন্ডিতম্মন্য তার মুখোশ এঁটে দেয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সত্যিকার মনুষত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুচিন্তিত দৈনিক কর্মসূচির ব্যবস্থা অনুপস্থিত। শিক্ষাক্রমের প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের কার্যকরি ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বাস্তবে তা বিরল। তাছাড়া মূল্যায়নে কোন ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য পাঠদানের সহায়ক সহজ লভ্য উপকরণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার অপরিহার্য হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাই যে শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনের শুরুতে থাকে প্রাণোচ্ছল কৌতুহলে উদ্দীপ্ত, বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে সেই চরাচর দাঁড়ায় নীরস জ্ঞানের ভারে জীর্ণ, স্বাধীন সৃজন ধর্মী চিন্তার চেয়ে গতানুগতিক চিন্তার বেশী স্বচ্ছন্দ, উৎপাদনশীল শ্রমে বিমুখ, আত্ম সর্বস্ব লক্ষ্যহীন এ উদভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। এই হলো আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ।

এ সমস্যার সমাধান হতে পারে শিক্ষাসূচির আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে। দেশের মাটির সাথে শিক্ষার আত্মিকযোগ ঘটাতে হবে বিদ্যালয়কে হতে হবে সমাজ ও গণভিত্তিক। যেহেতু এ দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর, সেহেতু অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচি হবে কৃষি ভিত্তিক। শিক্ষার্থীদের শ্রম অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রূপ হতে পারে-গ্রামোন্নয়ন করা, বয়স্ক শিক্ষাদান, স্বাক্ষরতা, অভিযান, সবুজ বিপ্লব, সেবামূলক কাজ, পশু-পরিচর্যা, জলসেচ, মাছ ধরা, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদি। তবে শিক্ষাসূচিকে গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করতে হবে। শিক্ষকেরাই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। কাজেই তাঁদের বেতন পেশাগত যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদায় উন্নতি ঘটাতে না পারলে কোনো শিক্ষা সংস্কারই সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। একজন শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার বয়স হচ্ছে–

(ক) ১১–১৬
(খ) ১১–১৭
(গ) ১১–১৮
(ঘ) খ ও গ সঠিক উত্তর

২। মাধ্যমিক স্তরকে বলা হয়–

(ক) আবেগময় জীবনের স্তর
(খ) গঠনমূলক জীবনের স্তর
(গ) বয়ঃসন্ধি কালের স্তর
(ঘ) উপরের সব কয়টি সত্য

৩। এ সময়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায়–

(ক) দ্রুত দৈহিক বিকাশ
(খ) দ্রুত সহযোগীতার অংশ
(গ) দ্রুত কল্পনার বিকাশ
(ঘ) উপরের সবগুলো

৪। মাধ্যমিক স্তরই নিদের্শ করে একজন শিক্ষার্থীর–

(ক) ভবিষ্যত জীবন
(খ) আশা-আকাংখা
(গ) কল্পনার জগত
(ঘ) বাস্তব জীবন

৫। মাধ্যমিক স্তরে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে–

(ক) ৮টি
(খ) ৭টি
(গ) ৬টি
(ঘ) ৫টি

পাঠ ৫.৩ উচ্চ শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হবেন।
- উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের সমর্থ হবেন।
- উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরের সংগে পরিচিত হবেন।
- আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা জানতে পারবেন।

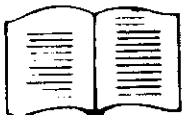

শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা নতুন কিছু সৃষ্টির উৎসরূপে কাজ করে। তাই, বিশ্বের এক অন্যতম উন্নয়নশীল এই বাংলাদেশে ত্বরান্বিত উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বস্বীকৃত এবং যে কোনো রকম উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজন জনগণের জাগ্রত চেতনার উন্মেষ যার সূতিকা গৃহই হচ্ছে সুষ্ঠু বাস্তব ধর্মী ও জীবনানুগ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আওতায় শিক্ষা গ্রহণ সাপেক্ষে ডিগ্রী প্রাপ্তদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশেরনমতো উন্নয়নশীল দেশেও উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রতিযোগীতা চলে মেধা থাক বা না থাক। তাই শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে দেশে কর্ম-সংস্থানের অভাব হেতু। পরিণামে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। এর শেষ কোথায় ভবিষ্যতই তা দেখিয়ে দেবে।

এ ইউনিট পাঠে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ক) ১৯৭২ সনে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় তারই প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সনে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠন ও দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার বিষয় এ রিপোর্টে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এ প্রেক্ষাপটেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার সুপারিশ সাপেক্ষে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা হয়। তাই বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে (১৯৮৫-৯০) উচ্চ শিক্ষার বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো প্রদত্ত হলো–

১। বিভিন্ন উচ্চতর কাজের জন্য সুনিপুণ, জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তৈরী করা।

২। গবেষণা ও জ্ঞানের মাধ্যমে নব দিগন্ত উন্মোচন করা।

৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা।

৪। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা, জ্ঞান-স্পৃহা, কর্মনুরাগ ও চিন্তার স্বাধীনতা, সম্যক বিকশিত করা।

৫। এমন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যাঁদের ন্যায়বোধ, মূল্যবোধ ও মানবিক বোধ সম্যকভাবে বিকশিত হয়।

৬। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ইনজিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।

৭। স্নাতক মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গুণগত মান কমিয়ে আনা।

৮। আন্ত-গ্রন্থাগার সহযোগীতা ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করা।

৯। জাতীয় ও স্থানীয় মূল সমস্যার সমাধান কল্পে গবেষণাগারে উন্নতি সাধন করা।

১০। ডিসএডভানর্টেজ (Disadvantage) গ্রুপের জন্য ষ্টাইপেন্ড, স্কলারসিপ ও লোনের ব্যবস্থা থাকবে।

উচ্চ শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উচ্চ শিক্ষা গণমুখী হতে পারে না। দেশে চাহিদা বিবেচনা করেই উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। সীমিত সংখ্যক মেধাবী ছাত্রকেই শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। যত্রতত্র কলেজ ও ইউনিভারসিটি করা যুক্তিসংগত নয়। এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করার চিন্তা বাঞ্চনীয় হবে।

প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক সময়ে উচ্চ শিক্ষাকে অনেকগুলো বিশেষ বিশেষ ধারায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে যেমন– উচ্চ শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন বেড়ে যায়, তেমন সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগেও উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এজন্য শিক্ষা কোর্সসমূহের পরিধি সম্প্রসারিত করা, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার মান উন্নতি করা ও উন্নত মান বজায় রাখা প্রয়োজন।

জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় শিক্ষাদান ছাড়াও উচ্চ শিক্ষার আরও একটি দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ অর্থে শিক্ষিত মানুষ গড়ে তুলতে উচ্চ শিক্ষা সাহায্য করে। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা তাদের মধ্যে কর্মাভ্যাস, জ্ঞান স্পৃহা, সততা ন্যায়বোধ, স্বাধীন চিন্তাবোধ, সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা ও তার সমস্যা সমাধানের আকাঙ্খা জাগ্রত করে। সংক্ষেপে বলা যায় জ্ঞানার্জন এবং চরিত্র গঠনে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর তাই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল সমাজের বর্তমান প্রয়োজনই মিটায় না তা জাতির অগ্রগতির দিক নির্দেশ এবং প্রেরণা সঞ্চার করে থাকে।

জাতির ভাগ্য ও জাতীয় অর্থনীতির সাথে উচ্চ শিক্ষা নিবিড়ভাবে জড়িত। জনগণের কর্মদক্ষতা একটি দেশের জাতীয় সম্পদ। কিভাবে এ জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন সাধন হবে, তার উপর নির্ভর করছে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রগতি; অর্থাৎ যাঁরা উচ্চ শিক্ষা থেকে লাভবান হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে তাঁরা সমাজে যে স্তরেরই হউক না কেন, তাঁদের সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চ শিক্ষাই প্রতিভার সন্ধান দিয়ে তার বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গবেষণার ফলে শুধু জ্ঞানের পরিসরই বৃদ্ধি পায় না, বরং শিক্ষাদান কার্যেও দক্ষতা জন্মে; এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ আবিষ্কার সমূহ মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সুতরাং শিক্ষা উন্নয়নের কথা চিন্তা করার সংগে সংগে গবেষণা ও শিক্ষাদানের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার মৌলিক নীতি ও দ্বৈত ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় আওতাভুক্ত কলেজ শিক্ষাকেই নির্দেশ করে। মোটামুটিভাবে উচ্চ শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে–

১। সাধারণ শিক্ষা– (আর্টস, সায়েন্স ও কমার্স)

২। টেকনিক্যাল এডুকেশন– (এগ্রিকালচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন ও হাইয়ার টেকনোলজি)

৩। প্রফেশনাল এডুকেশন– (টিচার এডুকেশন, মিউজিক, ফাইন আর্টস ও ল)

৪। মাদ্রাসা এডুকেশন ও

৫। স্পেশাল এডুকেশন।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা, সুযোগ ও সমাধান–

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা বহু সমস্যাপূর্ণ; বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও প্রকট। একটু লক্ষ্য করলে

দেখা যাবে যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এর জন্য অনেকখানি দায়ী। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০% জনই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা সীমিত থাকাই এর কারণ। শিক্ষা জীবন পূর্ণ হওয়ার আগে তাই অনেককে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিদায় নিতে হয়।

সমস্যাটি ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ১৯৮৩ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছিল সর্বমোট ৫৫ হাজার ৯৬ জন শিক্ষার্থী এবং এর মধ্যে ৪৫ হাজার ২৭৬ জনই দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই ভর্তি হতে পারে নি. ভাবষ্যতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে সেই সাথে স্বাভাবিক ভাবে বাড়বে এ সমস্যা। এটা সামগ্রীক সমস্যার একটা অংশ মাত্র।

শুধু তাই নয়, যোগ্যতার সাধারণ মানদন্ডকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা আবেদন পত্র দাখিলের সুযোগ পেলেও পরবর্তীতে বাছাইয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় তারা টিকে থাকতে পারছে না। কারণ আসন সংখ্যা সীমিত বলে সুযোগ মাত্র স্বল্প সংখ্যককে দেয়ার জন্য সাধারণ মানদন্ডকে বাদ দিয়ে বাছাইয়ের যে কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট ছকে বা নীতিগত মানদন্ডে ফেলা যায় না। তাই, পরীক্ষায় ভাল ফল করেও বহু মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যতা আজ পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে চাকুরীর ক্ষেত্রে। এমনিতেই আমাদের দেশে চাকুরীর সুযোগ খুবই সীমিত, তদুপরি আরও সংকুচিত হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে শর্ত হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার ফলে। সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এ দিকটাও বড় হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ একই সংগে জনবহুল ও নিঃসম্বল এবং দরিদ্র সীমার নিচের জনসংখ্যা অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ছে তবে তার একটা বড় অংশ নিম্ন মধ্যবিত্তের দল ভারী করে চলেছে, মধ্যবিত্ত আর থাকছে না। টাকার অংকে যারা এখনও মধ্যবিত্ত তাদেরও একটা বড় অংশের নাভিশ্বাস উঠেছে। উচ্চ বিত্ত সমাজ গত দশ বছরে অবস্থানটা মজবুত করে নিয়েছে, কিন্তু এটা মূলত লুটেরা সমাজ, এদের বিত্তের কোন সঠিক হিসেব নেই, এরা অত্যন্ত পলায়নপর এবং সমাজের বা দেশের ভালো-মন্দের চিন্তার শরীক এরা কোনোদিনই হতে পারছে না।

তাছাড়া উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভর্তি চলে পরস্পর সম্পর্ক বিহীন ও যোগাযোগ বিহীন ভাবে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতেও অহেতুক বিলম্ব ঘটে। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যদিও বা নির্দিষ্ট, কিন্তু ডিগ্রীও পরবর্তী স্তরে পরীক্ষাগুলো নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারছে না এবং পরীক্ষার ফলের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সময় নষ্ট হচ্ছে এক থেকে দুই বৎসর। তিন বা চার বৎসরের পথ অতিক্রম করতে লেগে যাচ্ছে সাত থেকে নয় বৎসর। ফলে, এ অসহনীয় পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অনেক বিত্তবান অভিভাবক ছেলেকে বিদেশ পাঠাচ্ছেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সমাজের আস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই সময় ও অর্থের অপচয় রোধ একটা জরুরী কর্তব্য হয়ে পড়েছে, তবে একক ভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ বিষয়ে কিছু সম্ভব হচ্ছে না। যৌথভাবে করা যাবে কিনা তাও বলা যায় না। তাছাড়া আসন সংখ্যা বাড়ানো অনুসংগ হয়ে দেখা দেয় শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণাদি বাড়ানোর প্রশ্ন। মূল সমস্যা হলো শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের স্বল্পতা। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ না বাড়ানো পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্র বিরাজিত কাঠামোগত, প্রতিষ্ঠানগত ও ব্যবস্থাপনাগত দিকগুলোর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়।

তাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের সংগে সংগে কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগে থাকা চাই। সংগতির প্রশ্ন তো অবশ্যই রয়েছে। এক কথায় বলা চলে যে, উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ হওয়া দরকার। উচ্চতর শিক্ষার দুয়ার অবারিত করার দাবী কোনোভাবে উপেক্ষিত হতে পারে না। প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার উদ্যোগে নেয়া হয়েছে যাতে করে সুষ্ঠুভাবে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করা যায়। উন্নত দেশগুলোতে বেতার টেলিভিশন ব্যবস্থা ও 'পত্র-যোগাযোগ কোর্স' প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্ভব

হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাদান। এ চাহিদা মেটাতে আমাদের দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ও পরীক্ষামূলক ভাবে দূর-শিক্ষনে বি.এড. কোর্স চালু করা হয় এবং তা কার্যকর বলে প্রমাণিত হওয়ায় দেশে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। বি.এড. কোর্সটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী কার্যক্রম। এ উন্মুক্ত কার্যক্রমে নিয়মিত শিক্ষার্থী ছাড়াও সকল বয়সের সকল পেশার লোকজন তাদের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষা ও ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পাবেন। তবে করেসপনডেনস শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সীমাবদ্ধ না রেখে কোন প্রাইভেট অর্গানাইজেশন এ ক্ষেত্রে এগিয়ে এলে তাতে সরকারই লাভবান হবে।

মানব সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই উচ্চ শিক্ষা, এই ধারনার সংগে সমাজের প্রয়োজনে উচ্চ শিক্ষা এই ধারনার মধ্যে এমন কোন বিরোধ নেই যার সন্তোষজনক মীমাংসা অসম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শিক্ষিত মানুষ গড়ে তুলতে উচ্চ শিক্ষা সহায়তা করে–
- (ক) জ্ঞান স্পৃহা বাড়াতে
- (খ) সমস্যা সমাধানের পন্থা বের করতে
- (গ) স্বাধীন চিন্তাবোধ জাগ্রত করতে
- (ঘ) উপরের সব কয়টিই সঠিক উত্তর

২। দেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা করে থাকে–
- (ক) প্রতিভার বিকাশ সাধন
- (খ) জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন
- (গ) সামাজিক উন্নয়ন
- (ঘ) উপরের সব কয়টিই সঠিক উত্তর

৩। দেশের গবেষণার উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা সাহায্য করে থাকে–
- (ক) জ্ঞানের পরিসরের বৃদ্ধি
- (খ) শিক্ষাদান কার্যের দক্ষতায়
- (গ) মানব জীবনের সমৃদ্ধিতে
- (ঘ) আবিষ্কারের পথ

৪। উচ্চ শিক্ষা বলতে বোঝায়–
- (ক) সাধারণ শিক্ষা
- (খ) টেকনিক্যাল শিক্ষ
- (গ) মাদ্রাসা ও স্পেশাল শিক্ষা
- (ঘ) উপরের সব কয়টিই সঠিক উত্তর

৫। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে না শতকরা–
- (ক) ৮২%
- (খ) ৮১%
- (গ) ৮০%
- (ঘ) ৭৯%

পাঠ ৫.৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের পটভূমি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্তরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং অন্যান্য স্তরের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্তরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অবগত হবেন।

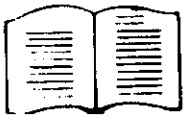

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পাঠদান ক্ষেত্রে শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যে সকল আধুনিক নীতি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার ভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। যেহেতু, বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্তর থেকে তার সহজাত ক্ষমতার ভিত্তিতে কর্মমুখী ও প্রয়োগশীল দক্ষতার বিকশিত করা সেহেতু, এ লক্ষ্যকে সার্থক করতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষা দান পদ্ধতির উন্নয়ন ও নবায়ন অপরিহার্য বলে কমিটি মনে করেন। কমিটি বর্তমান পাঠ্যসূচির তত্ত্বগত নীতি ও তাৎপর্য যথোপযুক্ত ভাবে উপলব্ধি করে সার্থক বাস্তবায়নের নিমিত্তে শিক্ষকের জন্য বিশেষ এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেন।

এ কমিটি কর্তৃক রচিত নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণী) এবং মাধ্যমিক (নবম–দশম শ্রেণী) স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে এসব পাঠ্যসূচীর সাথে সমন্বিত করারও সুপারিশ করেন।

শুরুতে এ উপমহাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বলতে শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান না বুঝিয়ে বরং সাধারণ বিষয় যেমন বীজগণিত, জ্যামিত, জ্যোতিবিদ্যঅ ও ইতিহাস জ্ঞান লাভ বুঝাত। কিন্তু ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচেই সর্ব প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, এতে বলা হয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক প্রেসিডিনসীতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়, এবং আরও বলা হয় যে চাকুরীরত শিক্ষকগণ যাতে উপবৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতনদানেরও সুপারিশ করা হয়।

এ প্রেক্ষিতে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬৯-১৮৮২ সালের উডের ডেসপ্যাচেই সর্ব প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, এতে বলা হয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেনসীতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা নর্মাল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়, এবং আরও বলা হয় যে চাকুরীরত শিক্ষকগণ যাতে উপবৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতনদানের ও সুপারিশ করা হয়, এবং আরও বলা হয যে চাকুরীরত শিক্ষকগণ যাতে উপবৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতনদানেরও সুপারিশ করা হয়।

এ প্রেক্ষিতে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬৯-১৮৮২ সাথে যথাক্রমে কুমিল্লা ও রংপুরে আরও দুটি নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ দিকে কুমিল্লাসহ নর্মাল বিদ্যালয়টি ১৮৮৫ সালে চট্রগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষককতা করার জন্য গ্রাজুয়েটদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেন ও সংগে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষণকালের

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেন যে, প্রত্যেক মহকুমায় পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে অন্ততঃ একটি করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থাকা প্রয়োজন। ফলে প্রদেশগুলোর প্রতিটি বিভাগে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এতে ব্যবহারিক শিক্ষণ ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়, যাতে কৃতকার্য শিক্ষকেরা সরকারী অথবা বেসরকারী বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে শিক্ষকতা করতে পারেন।

প্রাইমারী

দেশ বিভাগের পর বিভিন্ন সময়ে নিয়োজিত শিক্ষা কমিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা এভাবে অতীত থেকে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত (পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরির জন্য দু'প্রকারের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল যথা– প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টার। এদের আগে বলা হতো গুরু ট্রেনিং স্কুল এবং মোয়াল্লেম ট্রেনিং স্কুল। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল নিম্নমানের/ভর্তির যোগ্যতা ছিল মধ্য-বাংলা পাস।

প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য ১৯৫১ সালে (তদানীন্তন) পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পি.টি.আই) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় প্রবেশিকা পাস। ক্রমে ক্রমে এ স্তরের নিম্নমানের শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলগুলোর অবলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫২টি সরকারী প্রাথমিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ও বেসরকারী পর্যায়ে অনুরূপ ৩টি রয়েছে এবং এসব প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল হচ্ছে ১ বৎসর এবং আসন সংখ্যা ২০০ মাত্র। ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বি.এড. কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে পি.টি.আই কোর্স পড়ানো হয়। এই প্রশিক্ষণ শেষে সি.ইন.এড. ডিগ্রী দেয়া হয়। পি.টি.আই গুলোর প্রতিষ্ঠা লগ্নে এর দ্বিমুখী উদ্দেশ্য ছিল– (১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নত মানের শিক্ষক তৈরি করা (২) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরা যেন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে স্বাধীন দেশের জন্য উপযুক্ত ছাত্র তৈরি করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য করা। আজও আমরা সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। না পারার এ দীনতা শিক্ষা ব্যবস্থার পুরোভাগে আমরা যারা আছি প্রথমে বর্তায় তাদের উপর, আর এর গ্লানিটা বয়ে বেড়াচ্ছে গোটা জাতি ও দেশ।

মাধ্যমিক

অন্যদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের (৬–৮ শ্রেণী) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নর্মাল স্কুলের দেওয়া হতো এবং প্রশিক্ষণকালের মেয়াদকাল ছিল ২ বৎসর। ১৯৫২ সালের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে (পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ) নর্মাল স্কুলগুলোকে জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত করা হয়, তবে কোর্সের মেয়াদ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৬৬ সাল (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ) পর্যন্ত জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর ন্যায়ই শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল। এদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলা হতো "উচ্চ শিক্ষা সার্টিফিকেট"। ১৯৬৭ সাল হতে উক্ত কলেজগুলোর পরীক্ষা পরিচালনার ভার শিক্ষা বোর্ড গুলোর উপর ন্যাস্ত করা হয় এবং সার্টিফিকেটের নতুন নামকরণ হয় "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট।" ফলে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলোর শিক্ষকদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে বহিঃ পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাগত বৈশিষ্ট্য সমূহ বহুলাংশে লোপ পায়। এখানে উল্লেখ যে শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসায় পূর্বের জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলোর কোর্স ছিল প্রান্তিক অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আকর্ষনীয় ছিল না বলে

কলেজগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসার ফলে কলেজগুলোর পেশাগত বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে লোপ পেলেও কোর্সটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কেননা, সফলকাম শিক্ষকেরা প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালে এ জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলোকে কলেজ অব এডুকেশনে রূপান্তরিত করে ৩ বৎসর মেয়াদী ব্যাচেলার ইন এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে এ কলেজগুলোর অবলুপ্তি ঘটছে।

এ ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য বর্তমানে মোট ১১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে এ কলেজগুলোর কোর্সের মেয়াদ হলো ১০ মাস যদিও বহু আগে তা ছিল ২ বছর; এবং বর্তমানে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হলো একটি ২য় বিভাগ সহ গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী। বাংলাদেশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সবচেয়ে প্রাচীনত্বের দাবী রাখে।

কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বি.পি.এড (ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশ) ডিগ্রী প্রদান করে এবং এ কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী, শিক্ষাকাল দশ মাস।

টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ধারী শিক্ষককে ১ বৎসর ইন এডুকেশন ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদে ২ বৎসরকাল প্রশিক্ষণ দিয়ে বি.এড . (টেকনোলজি) ডিগ্রী দিয়ে থাকেন। শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট তিন রকম কোর্সে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। যথা ডিপ ইন-এড, এম.এড. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী দিয়ে থাকে। বি.এড. কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী এবং শিক্ষাকাল ১ বৎসর। এম.এড. কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা গ্রাজুয়েট এবং বি.এড. ডিগ্রী। ডিপ-ইন-এড, ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য এম.এড. কোর্সে মেয়াদ ১ বৎসর এবং সাধারণ গ্রাজুয়েটের জন্য ২ বৎসর। পি.এইচ.ডি. কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা এম.এড. ডিগ্রী এবং প্রশিক্ষণ কাল ২ বৎসর।

আলোচিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও দেশের ৯টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদে অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে আরও টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে এবং বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে দ্বিতীয় শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বর্তমানে যে সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে তা যোগ্য শিক্ষকের অভাব দূর করতে এখনও সক্ষম নয়। তাই এ অভাব দূর করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড) স্থাপিত হয়। এ কোর্সে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা ছিল প্রার্থীকে যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম পক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। ৪টি সেমিস্টারে এ কোর্সের সমাপ্তিকাল অর্থাৎ ৬ মাস পর পর এক সেমিস্টারে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর শিক্ষাকাল ২ বৎসর। শিক্ষক বিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থাতেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কোনো এক সেমিস্টারে ফেল করলেও একবার নতুন সুযোগ দেওয়া হবে। এ কোর্স দূর শিক্ষণে বি.এড. কোর্স নামে পরিচিত এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়– এ ডিগ্রীর সার্টিফিকেট প্রদান করতো। তবে বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র নিয়মিত কোর্স হিসাবে এই কোর্সটি প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত দূর শিক্ষণে বি.এড. কোর্স শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বি.এড. কোর্সর সমতুল্য।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ জাতীয় জীবনে অত্যন্ত জরুরী। এ প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষক সর্ব বিষয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে না। তাই জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষার ও শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের সন্তানদের কী প্রকারের, কোন ভাবে এবং কোন মানের শিক্ষা দিব তার উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যত অগ্রগতি। বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সুতরাং এ দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সংগে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের শিক্ষায় নতুন ধারা প্রবর্তনের সংগে

প্রয়োজন শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা যতই নতুন ভাবধারার প্রচলন করি না কেন শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ উপযুক্ত শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে যদি শিক্ষক শিক্ষণের মান উন্নত করা না হয়। দেশের শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য শিক্ষকের সংখ্যা ও মান উন্নত করতে হবে। অতএব, শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা বলা হয় শিক্ষকই মানুষ গড়ার কারিগর।

সুতরাং জাতীয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা অনস্বীকার্য।

এমন একদিন ছিল যখন যে কেউ শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করতে পারতো কিন্তু সভ্যতার ক্রম বিবর্তনে সমাজের প্রগতির ধারায় শিক্ষা ও শিক্ষাপনার সংজ্ঞা আজ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। শিক্ষকতা কোন যান্ত্রিক কাজ নয় বরং একটি শিল্পবিশেষ। উত্তম শিক্ষক একজন জীবন শিল্পী অন্য কিছু নন। তিনি জীবন্ত উপাদানে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেন নিছক জীবন্ত সত্তাই সে শিল্পীর প্রত্যক্ষ উপাদান। কাজেই বৈষয়িক কার্যে প্রয়োজন আত্মার ঔদার্য ও হৃদয় আবেদন। শুভংকরী লেনদেনের চেয়ে এখানে প্রয়োজন দৃষ্টিভংগীর সমন্বয় ও বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য। এ কারণেই শিক্ষকদের শিক্ষা বা শিক্ষক শিক্ষণ বলেই অভিহিত করা হয়।

শিক্ষকদের বিষয়বস্তুর উপর দখল থাকবে। শিক্ষকদের যদি বিষয়বস্তুর উপর ভাল দখল না থাকে তবে তিনি যত ভাল পদ্ধতিই ব্যবহার করুন না কেন, যত ভাল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করুন না কেন শিক্ষাদানে তিনি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শুধু বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেও ভাল হওয়া যায় না। এর জন্য আয়ত্ব করতে হয় শিক্ষাদানের বিভিন্ন কলা কৌশল পদ্ধতি। শিক্ষাদানের কোন চিরন্তনী পদ্ধতি নেই। আশ্রয় নিতে হয় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের। কারণ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান না জানলে শিক্ষাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা কোন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীদের চালচলন, ব্যবহার, আবেগ, অনুভূতি, শিশু মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে শিক্ষক কৃতকার্য হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে, শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন সমস্যা, অমনোযোগী শিক্ষার্থীর সমস্যা পেছনে বসা শিক্ষার্থীর সমস্যা ঘর ভাংগা শিক্ষার্থীর সমস্যা সুষ্ঠু সমাধান করতে গেলে শিক্ষকের শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্তভাবে অপরিহার্য।

তাছাড়া দেখা যায় আদর্শ শিক্ষকের স্বীয় আদর্শ শিক্ষার্থীকে তথা সমাজকে প্রভাবান্বিত করে। কারণ, তাঁর আদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব জীবন আদর্শ গঠন করে। তাদের এ জীবনাদর্শই ভবিষ্যতে জাতির জীবনাদর্শে পরিণত হয়। বস্তুত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের জীবনাদর্শই পরোক্ষভাবে সমাজকে আলোড়িত ও মহীয়ান করে। অতএব শিক্ষক শিক্ষণের যে প্রয়োজন আছে তা অনস্বীকার্য।

প্রশিক্ষণ শিক্ষককে আদর্শ সমাজ সেবক ও আদর্শ সংস্কারক হিসাবে গঠন করে। কাল বিবর্তনশীল, সে সংগে পৃথিবী ও জীবন পরিবর্তনশীল। বিশ্বে শিক্ষার ধারাও পরিবর্তনশীল সুতরাং শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণও পরিবর্তনশীল।

তাই, জাতির চাহিদাঅনুযায়ী এ পরিবর্তনশীল শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন একমাত্র শিক্ষক দ্বারাই সম্ভব। "যথায় যেইরূপ তথায় সেইরূপ"– এ শিক্ষানীতি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণই শিক্ষককে দিতে পারে।

শিক্ষকের বিশেষ গুণ হলো তাঁদের ধৈর্যশীলতা ও নিজ পেশার প্রতি ভালবাসা। যে শিল্পীর ধৈর্য নেই তিনি যেমন সুক্ষ্মশিল্প তৈরী করতে পারেন না, তদ্রুপ যে শিক্ষকের ধৈয্য নেই তিনিও মানুষ তৈরীতে সক্ষম নন।

যদিও অনেক সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরাও যথাযথ যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ, তবুও এর জন্য দায়ী জাতীয় প্রশাসনিক কাঠামো। এ গলদের মূল কারণই হলো পুঁথিগত জ্ঞানের সংগে ব্যবহারিক জীবনের মৌলিক বিচ্ছেদ। এতদসত্বেও পরিশেষে বলা যায় যে, "শিক্ষক জাতির মেরুদন্ড– কেননা জাতি গঠনের শক্তি হচ্ছে শিক্ষা যার পবিত্র ধারক হচ্ছেন শিক্ষক আর শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষকের একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার" তাই শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সমবেতভাবে সরকার, শিক্ষক এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা।

প্রাথমিক

পি.টি.আই.তে বর্তমানে যে পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত আছে তা বহুলাংশে কর্মাশ্রিত এবং অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত। এ ব্যবস্থাপণাকে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলা যায় না। এ শিক্ষাক্রমের শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি ছাড়াও বিষয়সূচি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া অনুশীলন পাঠ অভ্যাসকরণ পাঠ-টীকা প্রণয়ন, সহজলভ্য পাঠোপকরণ তৈরী এবং প্রদর্শনী পাঠের ব্যবস্থাসহ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য প্রত্যেক বিষয় পাঠের ব্যবহারিক দিক আছে। কিন্তু এতদসত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি হচেছ না। ৯৫% প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা সত্বেও শ্রেণী পাঠ আকর্ষণীয় হচেছ না। ৯৫% প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা সত্বেও যথাপুর্বং তথা পরং অবস্থা বিরাজ করছে।

তাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যাতে শিক্ষার্থীগণ নিম্নে প্রদত্ত গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হন–

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা
২। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা
৩। জাতীয় আদর্শ ও চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে শিশুদেরকে সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দক্ষতা অর্জন করা
৪। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত করতে শেখা
৫। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষাদর্শন ও সর্বাধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া
৬। শিক্ষাদানের বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি জানা
৭। সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষাদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা
৮। স্থানীয় সহজলভ্য দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা উপরকণ তৈরী করা
৯। বিদ্যালয় পরিচালনা, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শিশু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা মূল্যায়ন ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করা

এ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে ময়াদ কালে ২ বছরে উন্নীত হওয়ার পক্ষে সরকারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে উল্লেখ করেছেন, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য সে সকল আধুনিক নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সে, সকল আধুনিক নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। সব-পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি পি.টি.আই. প্রশিক্ষণ কোর্সের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর বর্তমান শিক্ষাক্রমে একটি বড় ত্রুটি হলো পেশাগত বিষয়গুলোর পাঠ্যসূচি অত্যন্ত সেকালে ও অবাস্তব। এছাড়া যেহেতু ভিন্ন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে লেখা বিদেশী

পাঠ্য বইগুলোই প্রধানতঃ পড়ানো হয়, সেজন্য এরূপ লব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিক্ষক জীবনে বিশেষ সহায়তা করে না। ফলে তারা প্রশিক্ষণ পায় বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষক হয় না। ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরা 'যা করণীয় তা' অনুসৃত হয় না। তাই, সমগ্র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আজও তাই মাধ্যমিক শিক্ষাম মনোন্নয়ন ঘটে নাই।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মনোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে নতুন করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির কিছু পরিবর্তন করেছেন। বর্তমানে শিক্ষক প্রমিক্ষণের শিক্ষাক্রম প্রধানতঃ নিম্নের বিষয় ও নম্বরগুলোর সমন্বয় গঠিত।

১। আবশ্যিক বিষয় ঃ (পাঁচটি)

(ক)	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	১০০
(খ)	শিক্ষানীতি	১০০
(গ)	শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা	১০০
(ঘ)	শিক্ষার ইতিহাস	১০০
(ঙ)	শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন	১০০

২। নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ (যে কোন দুটি)

(ক)	বাংলা	১০০
(খ)	ইংরেজী গণিত	১০০
(গ)	গণিত	১০০
(ঘ)	বিজ্ঞান	১০০
(ঙ)	ভূগোল	১০০
(চ)	ইতিহাস	১০০
(ছ)	সমাজ বিজ্ঞান	১০০

৩। ঐচ্ছিক বিষয় ঃ (যে কোন একটি)

(ক)	শিশুর ক্রমবিকাশ	১০০
(খ)	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	১০০
(গ)	প্রাথমিক শিক্ষা	১০০
(ঘ)	শিক্ষা প্রশাসন	১০০
(ঙ)	ইসলামিয়াত	১০০
(চ)	শিক্ষা গবেষণা	১০০
(ছ)	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানঙ	১০০
(জ)	চারু ও কারুকলা	১০০
(ঝ)	গার্হস্থ্য অর্থনীতি	১০০
(ঞ)	পেশাগত নীতি বিজ্ঞান	১০০
(ট)	মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	১০০

বিষয় আবশ্যিক বিষয়	অভ্যন্তরীন পরীক্ষার নম্বর	বহিস্থঃ পরীক্ষার নম্বর	সর্বমোট নম্বর
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	৫০	৫০	১০০
শিক্ষা নীতি	৫০	৫০	১০০
শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা	৫০	৫০	১০০
শিক্ষার ইতিহাস	৫০	৫০	১০০
শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন	৫০	৫০	১০০
নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ (যে কোন দুটি)			

	৫০	৫০	১০০
	৫০	৫০	১০০
ব্যবহারিক পাঠদান	১০০	১০০	২০০
মৌখিক পরীক্ষা	১০০	১০০	
ঐচ্ছিক বিষয় ঃ (যে কোন একটি)			
	৫০	৫০	১০০
		সর্বমোট=	১১০০

শিক্ষা গবেষণা (আভ্যন্তরীণ) ৪০ গবেষণা সন্দর্ভে ৫০ গবেষণা সন্দর্ভের উপর মৌখিক পরীক্ষায় ১০ মোট = ১০০

- প্রত্যেক কোর্স পরীক্ষার নির্ধারিত নম্বর
- মোট কোর্সের সংখ্যা

২। উপরের ছক অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়ে অভ্যন্তরীণ বহিঃস্থ পরীক্ষার নম্বরের অনুপাত ১ ঃ ১ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মোট নম্বর ৪৫০ এবং বহিঃস্থ পরীক্ষার মোট নম্বর ৪৫০, তবে সামগ্রিক মৌখিক পরীক্ষার জন্য ১০০ নম্বর পৃথকভাবে নির্ধারিত থাকবে। এ মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত একজন বহিঃপরীক্ষক এবং কলেজে ২ জন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কলেজের প্রশিক্ষণার্থী অধিক হলে কলেজ কর্তপক্ষের সুপারিশ ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় এ মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার জন্য একেক অধিক মৌখিক পরীক্ষক দল নিয়োজিত করবেন। মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদিগকে ব্যবহারিক পাঠদান বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও বি.এড. কোর্সে পঠিত সকল বিষয়ের উপর সাধারণ প্রশ্ন করা হবে এবং পরীক্ষার্থীদের উত্তরদানের মান বিচার করে পরীক্ষকগণ সর্বসম্মতভাবে নম্বর প্রদান করেন।

৩। প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালি স্থায়ী পরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি সকল আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে।

৪। পরিদর্শকদের মূল্যায়নের রেকর্ডের গড় যথাযথভাবে বিবেচনা পূর্বক পরীক্ষা কমিটি কলেজের সকল শিক্ষকদে সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় প্রশিক্ষণঅর্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান, বিষয়ক অভ্যন্তরীণ নম্বর চূড়ান্ত করবেন।

৫। প্রশিক্ষণার্থীদের ইচ্ছা করলে একটি ঐচ্ছিক বিষয় অধ্যয়ন করতে পারেন। এ বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৪০ নম্বর বাদ দিলে যদি কোন অতিরিক্ত নম্বর থাকে তা পরীক্ষার্থীর মোট নম্বরের সংগে যোগ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শুধু মাত্র দু প্রকারের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়–
- (ক) ১৯৫০ সাল পর্যন্ত
- (খ) ১৯৫২ সাল পর্যন্ত
- (গ) ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত
- (ঘ) ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত

২। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পি.টি.আই–
- (ক) ৫টি
- (খ) ৪টি
- (গ) ৩টি
- (ঘ) ২টি

৩। বাংলাদেশের সরকারী পর্যায়ে পি.টি.আই. রয়েছে–
- (ক) ৪০টি
- (খ) ৫২টি
- (গ) ৪৭টি
- (ঘ) ৫০টি

৪। বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে পি.টি.আই রয়েছে–
- (ক) ৫টি
- (খ) ৪টি
- (গ) ৩টি
- (ঘ) ২টি

৫। পি.টি.আই. এর মেয়াদ কাল হলো–
- (ক) ১ বৎসর
- (খ) ২ বৎসর
- (গ) ৩ বৎসর
- (ঘ) ৪ বৎসর

৬। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মেয়াদ ছিল–
- (ক) ৫ বৎসর
- (খ) ৪ বৎসর
- (গ) ৩ বৎসর
- (ঘ) ২ বৎসর

৭। নর্মাল স্কুলগুলো জুনিয়র ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল–
- (ক) ১৯৫০ সালে
- (খ) ১৯৫৬ সালে
- (গ) ১৯৬০ সালে
- (ঘ) ১৯৬৫ সালে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৫

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনা মূলক প্রশ্ন

১। প্রাথমিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ কেন?
২। কিরূপ অবস্থায় শিশু সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে?
৩। শিশুর আকাঙ্খিত বিকাশের জন্য কোন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন?
৪। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের সমীক্ষার ফলাফল কী?
৫। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠনের দাবী উঠে কেন?
৬। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন কেন গঠিত হয়?
৭। এ কমিশন কত সালে গঠিত হয় এবং কত সালে এ রিপোর্ট পেশ করা হয়?
৮। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার ভূমিকা কী?
৯। কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়?
১০। কীভাবে শিক্ষানীতিকে গতিশীল করতে হবে?
১১। মাধ্যমিক স্তরকে ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সতর বলা হয় কেন?
১২। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্কে কী?
১৩। মাধ্যমিক শিক্ষা কিভাবে শিক্ষার্থীকে দেশ গঠনের কাজের জন্য উপযুক্ত হতে সাহায্য করে?
১৪। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
১৫। মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?
১৭। উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বর্ণনা করুন।
১৮। কী কী কারণে একটি আধুনিক সমাজের অগ্রগতি উচ্চ শিক্ষার প্রকৃতি ও মানের উপর নির্ভর করে?
১৯। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীতা বিশ্লেষণ করুন।
২০। উচ্চ শিক্ষার সমস্যা সমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠ ৫.২

১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ক ৫। ক

পাঠ ৫.৩

১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ঘ ৫। গ

পাঠ ৫.৪

১। ক ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। ক ৬। ঘ

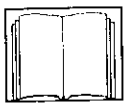

তথ্যসূত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খন্ড, ১৯৭৭।

গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান : পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা কমিশিন রিপোর্ট, ১৯৬০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ জাতীয় কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪।

গভর্নমেন্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান : পূর্ববঙ্গ প্রদেশের শিক্ষা পূণর্বিন্যাস কমিটি রিপোর্ট (আকরাম খাঁন রিপোর্ট), ১৯৫২।

গভর্নমেন্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৭৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ওয়ার্কশপ রিপোর্ট, ১৯৮৪।

মৌলিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ : গণ স্বাক্ষরতা ১৯৮০ এর প্রতিবেদন, ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ৫ম জাতীয় সম্মেলন, কুমিল্লা।

ডঃ আবু হামিদ লতিফ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা।

আব্দুলাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন : মাধ্যমিক শিক্ষার নব রূপায়ণ।

আব্দুল বারী : আমাদের শিক্ষার ইতিহাস।

ডঃ মোঃ গোলাম রসুল মিয়া : বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নের ধারাবাহিক ইতিহাস, পি, এইচ, ডি, থিসিস, ১৯৮২।

মুহাম্মদ আলী আজম : শিক্ষানীতি।

মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ : শিক্ষা দর্শণ ও শিক্ষানীতির সার কথা।

মুহাম্মদ শামসুদ্দীন : শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন।

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : জাতীয় শিক্ষানীতি

শ্রী নিবাস দে : প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা : কলেজ বার্ষিকী, ১৯৬৯-৭০, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৮১-৮২।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা : শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বি.এড, (গ্রুপ- ক) ১৯৮৫-৮৬।